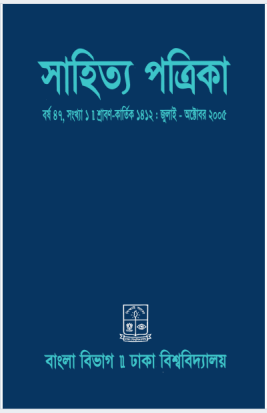

Vol. 47 | No. 1 | 2005

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'- কাব্য : নাটকীয়তা প্রসঙ্গ

Volume	47
Issue	1
Year	2005
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. মুস্তাফিজুর রহমান
Published online	October 1, 2005
DOI	10.62328/sp.v47i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.8
Pages	131-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্য : নাটকীয়তা প্রসঙ্গ

ড. মো. মুস্তাফিজুর রহমান*

(১.০) ভূমিকা

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের একজন অসাধারণ কবি 'হামিদ'।[১] তিনি মধ্যযুগের কারবালা বিষয়ক কাব্য 'সংগ্রামহুসন'-এর রচয়িতা। হামিদ তাঁর একাব্যটি সতের শতকের শেষার্ধে রচনা করেছেন।[২] কিন্তু একাব্যের রচয়িতার স্বহস্তলিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। তবে এ কাব্যের একটি মাত্র পুথি (=প্রতিলিপি) পাওয়া গিয়েছে। (এ পুথিটি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ; এটি এখন ঢাকার বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে।) পুথিটির অনুলিপিকাল : ১১৪৭ সাল[৩] (=১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু মূল কাব্য আরও পূর্বে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের 'লিপিকরের পুষ্পিকা'-র অন্তর্গত ভাষ্য স্মর্তব্য :

> ইআ ইমাম সা ইমাম ॥
> ইতি থানেদার নয়াব শ্রীজবরদস্থ খাঁ
> উলাদে শ্রীমিআ সুলতান পং মহরাপুর
> মৌজে রাজনপুর হকমালিক শ্রীদুস্থ মাং
> লিখিতং দুসং শ্রীআছে খাঁ কিং ফতিদার
> তেং ২৭ বম্বা সং ১৪ হদ্দে রোজ দুসম্বে
> লেখনস্থান শ্রীসেক জামান মীর টঙ্গি
> ইতি সন ১১৪৭ সাল। (সংগ্রামহুসন, পৃ ১৩১)[৪]

বিশিষ্ট পুথিবিশারদ ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যটি সম্পাদনা করে তা স্বকীয় উদ্যোগে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> লিপিকর প্রমাদের কণ্টক এড়িয়ে রচয়িতার মূলভাষার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারলে 'সংগ্রামহুসন'- প্রণেতা হামিদকে ষোল শতকের কবি বলে ধরে নিতে ইচ্ছা হয়। এজন্য আমরা এ কাব্যের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় সতের শতকের শেষার্ধের পরবর্তী নয় বিবেচনা করেছি।[৫]

---

* প্রাবন্ধিক ও গবেষক ; খণ্ডকালীন শিক্ষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খ্যাতিমান কবি হামিদের বাসস্থান সম্পর্কিত কোনো তথ্য আমরা তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের কোথাও লক্ষ করি না। তবে এ কাব্যে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ কাব্যের প্রধান কাঠামো "'সাধু'-বাংলাভাষা"। তাই যে লক্ষণগুলো সমকালীন সাধু বাংলাভাষা থেকে এ কাব্যের ভাষাকে পৃথক করেছে, সেসব লক্ষণ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা আবশ্যক। উল্লিখিত লক্ষণগুলোর কতিপয় দৃষ্টান্ত[৬] এখানে উল্লেখ করা হলো :

(ক) 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের কোনো কোনো স্থলে শব্দমধ্য 'উ' (বা 'ঊ')- স্বর 'অ'- স্বরে পরিণত হয়েছে। যথা : সন্ন(<শূণ্য), থৈলা(<থুইলা) প্রভৃতি। কবি হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এ শব্দগুলোর ব্যবহার করেছেন। যেমন :

সন্ন সৈন্ধুক নিলা নবির গুচর। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৩৮)
নিরদিআ চির থৈলা তাহার ভিথর ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৩৯)

(খ) 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের কোনো কোনো স্থলে 'অ'-স্বর 'আ'-স্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। যথা : সান্তান(<সন্তান), লাম্প(<লম্ফ), প্রানাম(<প্রণাম) প্রভৃতি। কবি হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এগুলোর ব্যবহার করেছেন। যেমন :

কপটে ভাণ্ডিলা কোফি আলির সান্তান ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫২)
ঘোড়াকে প্রানাম করি উঠঞি লাম্প দিআ ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ১২৮)

(গ) 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের কোনো কোনো স্থলে শব্দাদ্য ও শব্দমধ্য 'ও'-স্বর 'উ'(বা 'ঊ')-স্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। যথা : তুমার(<তোমার), টুনা(<টোনা)। ভূগ(<ভোগ) প্রভৃতি। কবি হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এগুলোর ব্যবহার করেছেন। যেমন :

আছএ সন্ধুক এক তুমার ঘরেতে। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৩৮)
ভাণ্ড এক আনহ তুমার ঘর হনে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৩৯)
সেই দেসে টুনা জানে বৃদ্ধ এক নারী। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫২)
টুনার এক থলি বগলে করিআ। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৩)
অখনে করহ ভূগ মদিনাতে গীয়া। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৯৪)

সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় আরবিফারসিহিন্দি ভাষার শব্দাবলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কথিত হয় যে খ্রিস্টীয় চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হজরত শাহজালাল তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়া বা শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সিলেটে আসেন। এঁদের অধিকাংশই আরব থেকে তাঁর সঙ্গী হন নি। বরং বেশ কিছু সংখ্যক হয়তো বাগদাদ, দিল্লি, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁর আগমনে এবং তাঁর অলৌকিক শক্তি ও ধর্মপ্রচারের ফলে সেখানকার অনেক পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে সিলেটের হিন্দু রাজার পরাজয় ঘটে। উল্লেখ্য যে হজরত শাহজালাল আরবিফারসি-ভাষায় অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং হজরত শাহজালার ও তাঁর শিষ্যদের আগমনের মধ্য দিয়েই সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় আরবিফারসিহিন্দিশব্দ স্থান লাভ করে।[৭] স্মরণযোগ্য : তখনও আধুনিক উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়নি। আমরা পূর্বেই বলেছি : খ্রিস্টীয় সতের শতকের শেষার্ধে হামিদের 'সংগ্রামহুসন'- কাব্যটি রচিত হয়। মূলত এ কাব্যটি

ফারসি থেকে অনূদিত এবং সিলেটের আঞ্চলিক বাংলাভাষায় রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের কারবালা বিষয়ক বাংলা কাব্যগুলোর মধ্যে হামিদের 'সংগ্রামহুসন' অন্যতম।

(২.০) নাটকীয়তার স্বরূপ

নাটকে বিভিন্ন লক্ষণ (symbol) পরিদৃষ্ট হয়। এ লক্ষণগুলো কিঞ্চিৎ, অধিক কিংবা বিশেষ হয়ে থাকে। আবার এগুলো বাহ্য কিংবা অভ্যন্তরীণ থাকে। মূলত এ লক্ষণগুলোর কারণেই নাটক তার বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। আর এর ফলে নাটককে উপন্যাস কিংবা কবিতা অথবা ছোটগল্প রূপে অভিহিত না করে, 'নাটক' বলেই শনাক্ত করা হয়। আর এখানেই 'নাটকীয়তা'(='Dramatics') পরিস্ফুট হয়।[৮] স্মরণযোগ্য : কেবল নাটকীয়তার কারণেই পাঠক বা দর্শকের নিকট 'নাটক' অতি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কাহিনীকাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে 'নাটকীয়তা' লক্ষ করা যায়। তবে নাটকে প্রাপ্তব্য 'নাটকীয়তা'-র স্বরূপ কিছুটা ভিন্ন রকমের। এজন্য 'নাটক' কিংবা 'কাহিনীকাব্য' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমূলক নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। তাই 'নাটকীয়তা'-সম্পর্কে ধারণা না থাকলে যেমন 'নাটক' লেখা যায় না, তেমনি 'নাটকীয়তা' অনুপস্থিত রেখে 'কাহিনীকাব্য কিংবা 'উপন্যাস' রচনা করা সম্ভব হয় না। এজন্য ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার প্রমুখ ব্যক্তিগণের 'নাটকীয়তা'-সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্চনীয়। 'নাটকীয়তা' সম্পর্কে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা'-শিরোনামার গ্রন্থে প্রখ্যাত সমালোচক গুস্তাফ ফ্রেতাগের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন। এ উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ করা হল :

> those emotions of the soul which steal themselves to will and to do and those emotions of the soul which are aroused by a deed or course of action.[৯]

ফ্রেতাগের মতে : ঘটনা বা আবেগ মাত্রই নাটকীয়তা নয়। যে-ঘটনা কিংবা আবেগ ব্যক্তির সুদৃঢ় ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয়, তাকে নাটকীয়তা বলে শনাক্ত করা যায় না। সুতরাং যে-বাসনা ও ইচ্ছাশক্তি অ্যাকশন-রূপে ব্যক্ত হয় না অথবা যে-বাসনা কিংবা ইচ্ছা অ্যাকশনের সাহায্যে উদ্বোধিত হয়না, তা নাটকীয়তা নয়।[১০] পূর্বেই বলা হয়েছে : 'নাটক' কিংবা 'কাব্য' প্রভৃতি তখনি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ; যখন তার 'নাটকীয়তা' পরিস্ফুট হয়। সুতরাং 'নাটকীয়তা'-ই হল কাহিনীকাব্য, নাটক প্রভৃতি রচনার প্রধান উপজীব্য বিষয়। তাই 'নাটকীয়তা'-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। এ নাটকীয়তার পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করা যায়। আর সেগুলো হল নিম্নরূপ :

(ক) 'অ্যাকশন' [(=নাট্যক্রিয়া) ('action')] ও 'রিঅ্যাকশন' [(=নাট্যপ্রতিক্রিয়া) ('reaction')],
(খ) 'নাট্যদ্বন্দ্ব' ('conflict'),
(গ) 'নাট্যউৎকণ্ঠা' ('suspense'),

(ঘ) 'নাট্যশ্লেষ' ('irony') এবং

(ঙ) 'আকস্মিকতা' ('surprise')।

উপর্যুক্ত লক্ষণগুলোর মধ্য দিয়ে কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যটির 'নাটকীয়তা' কোন্ কোন্ স্থলে রয়েছে, পর্যায়ক্রমে সেগুলোর আলোচনা করা হবে।

(২.১) 'সংগ্রামহুসন'- কাব্যের 'নাটকীয়তা'-র সারোদ্ধার : 'অ্যাকশন' ও 'রিঅ্যাকশন'

'অ্যাকশন'-শব্দটির অর্থ : কাজ করা (Doing)। এজন্য অ্যাকশনের বর্ণনায় কোনো 'ক্রিয়াপদ' ব্যবহার করা উচিত।[১১] যে অ্যাকশনের পিছনে কোনো অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকে না, তা কখনই অ্যাকশন হতে পারে না। সুতরাং একটি 'অ্যাকশন' কেবল 'কাজ করা' বোঝালেই হবে না, এ-কাজের পিছনে কোনো অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। অ্যাকশন দুই[১২] প্রকারের হয়। যেমন :

(ক) দৈহিক অ্যাকশন (physical action),

(খ) বাচনিক অ্যাকশন (verbal action)

মানব শরীর দিয়ে কোন কাজ করা বোঝালে তা দৈহিক অ্যাকশনের মধ্যে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় : একজন অভিনেতা তার সহঅভিনেতার মুখে ঘুষি মারবে। তাই সে-অভিনেতার ডান হাতটি সহঅভিনেতার নাকের সামনে এবং তার মুখে রাগের অভিব্যক্তি। এটি অবশ্যই একটি 'কাজ'। তাই এ কাজটির নেপথ্যে নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। আবার এ উদ্দেশ্যের অর্থ আছে । ধরা যাক : একজন অভিনেতা অফিস থেকে বাসায় ফিরছে। এসময় একজন বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হল। বন্ধুটি পিছন থেকে তার জামার কলার চেপে ধরল। অতঃপর সে তাকে জড়িয়ে ধরল। এখানে হেঁটে আসা, কলার ধরা, জড়িয়ে ধরা- এগুলো সবই অ্যাকশন। কারণ এগুলো দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে এবং এ কাজগুলোর নেপথ্যে কোনো উদ্দেশ্য আছে। আবার বিপরীতক্রমে, বন্ধুটির জড়িয়ে ধরার পর অভিনেতাটি তাকে ঘুষি মারল। অতঃপর বন্ধুটি ভূমিতে পড়ে গেল। [ইতোমধ্যে অনেক লোকজন এসে ভিড় করল।] এগুলো দ্বারা নিশ্চয়ই কোনো কাজ করা বোঝায়। আর এ কাজগুলোকে 'রিঅ্যাকশন' বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ 'রিঅ্যাকশন' হল অ্যাকশনের বিপরীত দিক।

'বাচনিক অ্যাকশন' হল কথা বা সংলাপের মাধ্যমে কোনো কিছু বলা। অভিনেতা পাণ্ডুলিপির লাইনগুলো যখন বলে, তখন সেগুলোকে 'বাচনিক অ্যাকশন' বলে শনাক্ত করা যায়। যেমন : 'আমি তোমাকে খুন করব।' এটি একটি বাচনিক অ্যাকশন। স্মরণযোগ্য : বাচনিক অ্যাকশনের নেপথ্যেও কোনো অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকবে। এ অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোনোভাবেই বাচনিক অ্যাকশন সৃষ্ট হতে পারেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় : প্রাত্যহিক জীবনে আমরা একে অন্যের সঙ্গে 'কথা' বলি। কিন্তু এগুলোকে বাচনিক অ্যাকশন রূপে গণ্য করা যাবে না। কারণ এগুলোর নেপথ্যে

কোনো অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকে না। আবার 'দৈহিক অ্যাকশন' ও 'বাচনিক অ্যাকশন' মিলে একটি 'পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন' (Full of action)[১৩] সৃষ্ট হয়। এ পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে একটি নাটক বিকশিত হয় এবং সম্পূর্ণতা পায়। নাট্যাচার্য স্তানিস্লাভস্কি (১৮৬৩-১৯৩৮ খ্রি.)[১৪] মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক অ্যাকশনের মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বন্ধন লক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর ভাষ্য এখানে স্মর্তব্য :

> প্রতিটি শারীরিক অ্যাকশনের কিছু মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিটি মনস্তাত্ত্বিক অ্যাকশনের কিছু শারীরিক দিক রয়েছে। ...কখনো কখনো বাইরের সম্পূর্ণ গতিহীন অবস্থা দেখেও ভিতরে অ্যাকশন ব্যক্ত হতে পারে। একটা দুঃখজনক খবর শুনে কোনো একজন পাথরের মতো নিশ্চল হতে পারে। বাইরের শারীরিক অভিব্যক্তি ছাড়া ভিতরের কোন অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হতে পারে না। আমাদের মনের ভিতরের অভিজ্ঞতাকে আমরা আমাদের শরীর দিয়েই ব্যক্ত করি।[১৫]

স্তানিস্লাভস্কির ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> 'মানুষের আত্মিক উপাদানগুলো ও শরীরের অংশগুলো অবিভাজ্য'। ভাব বা মেজাজ, কামনা-বাসনা, অনুভূতি, উদ্দেশ্য, উচ্চাশা প্রভৃতি মানুষের জীবনে মনস্তাত্ত্বিক জটিল দিকগুলো সরল শারীরিক অ্যাকশনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।[১৬]

দার্শনিক অ্যারিস্টোটল (৩৮৪-২২ খ্রি. পূ.)[১৭] 'ট্রাজেডি'-র সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> ...imitation of an action ...in the form of action, not of narrative.[১৮]

অ্যারিস্টোটল উপর্যুক্ত ভাষ্যটির মাধ্যমে 'ট্রাজেডি'-র অর্থ অনুসারে 'অ্যাকশন'-কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ট্রাজেডি হবে অ্যাকশনের অনুকরণ। যে-কোনো নাটকে প্রথম থেকে শেষ অবধি অ্যাকশন সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে নাটকের চরিত্রাশ্রয়ী ঘটনাগুলো হল 'অ্যাকশন'। নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কথোপকথন ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে ঘটনা বিকশিত হয় এবং অ্যাকশনের গতি তীব্রতর হয়।[১৯] গতিশীল অ্যাকশনের সাহায্যে নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টোটলের ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> Tragedy is essentially an imitation not of persons but of action and life, of happiness and misery. All human happiness or misery takes the form of action ; the end for which we live in a certain kind of activity, not a quality.[২০]

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের 'নাটকীয়তা'-র সারোদ্ধারের চেষ্টা করব।

হামিদের 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের 'হাসন-হুসনের করুণ মৃত্যুর পূর্বাভাস'-অধ্যায়ে 'নাটকীয়তা' লক্ষ করা যায়। এখানে 'নবী' ও 'ফাতিমার'-র কথোপকথনের মাধ্যমে

'অ্যাকশন', 'রিঅ্যাকশন' ও 'পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন'-এর আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : ফাতিমা কাঁদছেন। তাঁর মন ভীষণ ভারাক্রান্ত। ফাতিমার কান্না শুনে নবী খুবই দুঃখিত হলেন। তাই নবী ফাতিমার কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। এদৃশ্যটিতে হামিদ চমৎকারভাবে নাটকীয়তার সঞ্চার করেছেন। যেমন :

দুহিতার স্থানে নবী পুছিতে লাগিলা ॥
কেনে কান্দ আএ মাতা বাপের পরানি।
দেখি দুঃখে দহে দেহা কহ এই বানি ॥ (সংগ্রামহুসন পৃ. ৩৭)

ফাতিমা এর উত্তরে বললেন :

ই কারনে কান্দু মুই সুন মহাসএ ॥
আজির দিবসে সাজি সব সিসুগন।
অঙ্গেত পহিলা তারা বিচিত্র বসন ॥
দেখিআ উচাট করে মর সিসুগন।
আমাকে পহায় বোলে বিচিত্র বসন ॥
পুরান কাপড় আমি না ধরিমু গায়।
রঙ্গিন বসন আমি পিন্ধিতে যুয়াএ ॥
এতেক ভাবিআ কান্দু সুন আএ বাপ।
কেবা ঘুছাইব মর এই দুঃখ তাপ ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৩৭-৩৮)

উপর্যুক্ত ছত্রগুলোর মধ্য দিয়ে অ্যাকশন, রিঅ্যাকশন ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশনের প্রাবল্য চমৎকারভাবে লক্ষ করা যায়। হামিদ অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'নবী' ও 'ফাতিমা'-র মধ্যে কথোপকথনের সাহায্যে অ্যাকশন, রিঅ্যাকশন ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশনের মাধ্যমে নাটকীয়তা এনেছেন। উপর্যুক্ত ছত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে, আমরা লক্ষ করি : ফাতিমা কাঁদছেন। অতঃপর ফাতিমার কান্না শুনে নবী এলেন এবং তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এর উত্তরে ফাতিমা বললেন : আজকের এই বিশেষ দিনে সব শিশুই নতুন জামাকাপড় পরেছে ; শুধু আমার 'হাসন-হুসন'-ই এর ব্যতিক্রম। কিন্তু হাসন-হুসন পুরনো কাপড় পরতে চাইছে না। পিতা, এই দুঃখ আমি কেমন করে সহ্য করব! স্মরণযোগ্য : নবী ও ফাতিমা হলেন পিতা ও কন্যা। এঁদের আন্তরিক সম্পর্কের সাহায্যে হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে উৎকৃষ্ট 'নাটকীয়তা' সৃষ্টি করেছেন।

এরপর অনেক লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে হাসন-হুসন শিকার করতে গেলেন। বহুদূরবিস্তৃত বনে তাঁরা প্রবেশ করলেন। সূর্যের প্রখর তাপে তাঁরা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু গভীর জঙ্গলের ভিতর কোথাও খাবার পানীয় পাওয়া গেল না। ফলে তাঁরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। হাসন ঘরে গিয়ে খাটের উপর বসলেন। অতঃপর তিনি পরিধেয় বস্ত্র খুললেন। এরপর তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বললেন :

পীআসে জাইতেছে আমার পরান
আএ বিবি পানি দেও করিবারে পান
সহজে নারি জাতি নাহি বুদ্ধি গ্যান।

আপনার খুবি চাইআ না ভাবিলা আন ॥
পূর্ব্ব লেখা আছে কর্ম্মে...। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৫)

কুটনী বুড়ী কর্তৃক বিষমিশ্রিত গুলীটি হাসনস্ত্রী পূর্বেই পানিতে মিশিয়ে রেখেছিলেন। এ-পানি খেয়েই তৃষ্ণার্ত হাসন মৃত্যুবরণ করলেন। এমতকালে হাসনস্ত্রী কাঁদতে থাকলেন এবং বললেন :

সরথের চন্দর মর কথা লুকইলা।
নিকরুণা বিধি মর বুদ্ধি বিস্বরিলা ॥
কি ক্ষেণে পুহাইল মর আয়ুকার নিসি।
হেলায় হারিলু মুই গগনের সসি ॥
ভূমিতে লুটিআ মাথা হানে ঘনে ঘন।
আর না দেখিমু পুনি এ চান্দ বদন ॥
জন্মকালে লেখিলেক প্রভু করতার।
মর সম পাপী নাই জগত সংসার ॥
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কুন নারি।
শ্বামি বধ কৈলু মুই পাপ দুরাচারি ॥
বসন ফাড়িআ বিবি কৈলা খান খান।
কি কারনে আছে মুই পাপিনীর পরান ॥
মর হেন অপজস রহিল সংসারে।
আপনার হাথে মুই বধিলু শ্বামিরে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৫-৫৬)

উপর্যুক্ত ছত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা অ্যাকশন, রিঅ্যাকশন ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশনের আধিক্য লক্ষ করি। যেমন :

(ক) লোকবলসহ হাসন-হুসনের শিকারে যাওয়া,
(খ) হাসন-হুসনের শিকার থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন,
(গ) হাসন স্ত্রী কর্তৃক হাসনকে পানি পান করানো,
(ঘ) মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হাসন,
(ঙ) হাসন স্ত্রীর বিলাপ ইত্যাদি।

এগুলোকে দৈহিক আকশন রূপে শনাক্ত করা যায়। এরপর হাসন তাঁর স্ত্রীকে বললেন "আএ বিবি পানি দেও করিবারে পান," হাসন স্ত্রীর স্বগতোক্তিকে বাচনিক ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন বলে চিহ্নিত করা যায়। স্মরণযোগ্য : ক্রন্দনরত হাসন স্ত্রীর কথাগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক অ্যাকশন রূপে শনাক্ত করা যায়। স্তানিস্লাভস্কি মনস্তাত্ত্বিক অ্যাকশনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এরপর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের 'উমরকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এজিদের সৈন্য প্রেরণ : হুসনের যাত্রাপথ অনুসরণ'-র অংশে দৈহিক অ্যাকশনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরিচয় মেলে। এ পরিস্থিতিকে হামিদ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

সাগর তরঙ্গ হেন চলে সেনাগন।
খাণ্ডা সব ধরে করে আর সরাসন ॥

স্বন্য সেনাপতি সব একত্র হইআ।
হুসনের পিছে২ চলিলা ধাইআ ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৬৫)

এরপর এ কাব্যের 'হরএজিদের স্বপক্ষত্যাগ : হুসনপক্ষে যোগদান'-অংশে 'হরএজিদ' ও হুসন-এর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাচনিক ও পূর্ণাঙ্গঅ্যাকশনের আধিক্য লক্ষ করা যায়। হরএজিদ ও হুসনের কথোপকথনের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :

[হরএজিদ] : সুনহ ছৈয়দজাদা আওলাদ মস্ত্বফার ॥
এমত জানিতু যদি এরার চরিত্র।
সর্ব্বথা নাসিতু মুই তাহার সহিতে ॥
[হুসন] : ...বাপু কিবা নাম তোর।
[হরএজিদ] : হরএজিদ নাম মোর জানহ সত্বর ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৬৭)

উপরিউল্লিখিত ছত্রগুলোর মাধ্যমে 'নাটকীয়তা'-র প্রকৃত উদাহরণ মেলে। পূর্বেই বলা হয়েছে : হরএজিদ ও হুসনের কথোপকথন বাচনিক ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশনের পর্যায়ভুক্ত। স্মরণযোগ্য : 'নাটকীয়তা' অন্বেষণের ক্ষেত্রে 'হরএজিদ' ও হুসন-চরিত্রকে আমরা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি। অতঃপর আলোচ্য কাব্য থেকে সংলাপ উদ্ধৃত করেছি। উল্লেখ্য যে এ কাব্যের উদ্ধৃত ছত্রগুলোর মধ্যে 'হরএজিদ' কিংবা 'হুসন'-এর নামের উল্লেখ রয়েছে।

এরপর আলোচ্য কাব্যে 'রহবার যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'জাফর ও কাসিমের যুদ্ধ এবং মৃত্যু', 'অহবার যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হরএজিদের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হাসনপুত্র কাসিমের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হরএজিদের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হাসনপুত্র কাসিমের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'আলী আকবারের যুদ্ধ ও মৃত্যু', পরদিন এজিদ বাহিনী ও তুঙ্গা-সেনাদলে যুদ্ধ : 'তুঙ্গার মৃত্যু ও তাঁর দলের বিপর্যয়' ইত্যাদি উপশিরোনামাভুক্ত ছত্রগুলোর মধ্য দিয়ে 'অ্যাকশন, রিঅ্যাকশন, বাচনিকঅ্যাকশন ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন'-এর আধিক্য লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে এ কাব্য থেকে কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা হল :

জায়ফর তৈয়বের পুত্র জায় চলি।
কাছিম [চরার] সুত এই দুই এ মিলি ॥
দুই আছআর হৈআ জায় দুইজন।
এই দুই আগে হৈলা করিবারে রন ॥
দুই দিগে হৈআ দুইএ কাটে বহু স্বন্য।
চারি দিঘে সবে মিলি কহে ধন্য২ ॥
আকর্ণ্ন পুরিআ বান মারএ অপার।
তারাঅ মারএ বান হাজারে২ ॥
বান ফুটি দুইর অঙ্গে বহএ রূধির।
পারিজাত পুষ্প হেন দুইর সরির ॥
দুই দিঘে হৈআ মারি দুই বির জায়।
এজিদের স্বন্য রনে ত্রাসে পলায় ॥
পঞ্চাসত সষ্ঠ আদি কাটিলা রনেতে।

ভাঙ্গিলা এজিদের দলবল বহু তাতে ॥
এই মতে স্বন্য সব রনেত ভাগীলা।
দেখি সেনাপতিগনে ঘোড়া আগে কৈলা ॥
বিস বান সবে মিলি মারিল পুরিআ।
মহ গেলা দুই বিরে সেই বান খাইআ ॥
ঘোড়া হনে পড়ে দুই রনে[র] ভিথর। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৭১)

উপর্যুক্ত ছত্রসমূহ বিশ্লেষণ করলে এসব সারকথা পাওয়া যায় : জায়ফর তৈয়বপুত্র অশ্বারোহণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এর সঙ্গে কাসিমও যোগ দিলেন। দুইজনে দুই দিক থেকে অসংখ্য সৈন্য বধ করলেন। এঁদের আক্রমণে এজিদের সৈন্য দলছুট হয়ে পালিয়ে গেল। বিপরীত দিক থেকে সেনাপতিগণের বিষবাণে জাফর ও কাসিম ঘোড়া থেকে ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং মৃত্যু বরণ করলেন। স্মরণযোগ্য : যে কোন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অ্যাকশন ও রিঅ্যাকশনের আভাস মেলে। আলোচ্য কাবাংশে জাফর ও কাসিমের যুদ্ধ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অজস্র অ্যাকশনের অস্তিত্ব শনাক্ত করা যায়। রণাঙ্গন ছেড়ে এজিদ সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রিঅ্যাকশন পরিস্ফুট হয়েছে। বিষবাণ খেয়ে জাফর ও কাসিমের ভূমিতে পড়ে যাওয়ার মাধ্যমেও রিঅ্যাকশন প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এরপর হরএজিদের সঙ্গে এজিদ সৈন্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। এ যুদ্ধে হরএজিদ নিহত হলেন। হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে নিম্নোক্তভাবে এ দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়েছেন :

ধনু ধরি সহস্র(২) আছআর।
হর এজিদের উপর ধাইলা একবার ॥
আকর্ণ্ন পুরিআ বান মারে সতে২।
সন্ধান পুরিলা গীআ হর এজিদের মাথে ॥
নব সত চৌআলিসি কিবা পয়াতালিস।
সহিদ হৈল হর এজিদ খাইআ বান বিস ॥(সংগ্রাসহুসন, পৃ. ৭৪)

উপর্যুক্ত ছত্রসমূহে আমরা 'অ্যাকশন' ও 'রিঅ্যাকশন' দৃশ্যমান হতে দেখি। এজিদ সৈন্যদের সঙ্গে হরএজিদের তুমুল যুদ্ধের পর হরএজিদ নিহত হলেন। অর্থাৎ এজিদ সৈন্যগণ কর্তৃক হরএজিদ মৃত্যুবরণ করলেন। এখানে এজিদ সৈন্যগণের যুদ্ধাবস্থাটি 'অ্যাকশন' এবং হরএজিদের নিহত হওয়ার অবস্থাটি 'রিঅ্যাকশন'-এর পর্যায়ভুক্ত বলে শনাক্ত করা যায়।

এরপর হাসনপুত্র কাসিম ও হুসনের কথোপকথনের দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'সংগ্রাসহুসন'-কাব্যে এ দৃশ্যটি নিম্নরূপ :

আজ্ঞা কর চাচা মুই জাইতে রনয়।
হুছনে কহিলা বাবা ই নি কব হএ ॥
তুমার বাপ মরিবার কালেত আমাতে।

সমর্পিআ দিছঞি তাই মর হাথে২ ॥
কাছিমে কহিলা হেন [সুন মর] কথা।
সাহাদত লৈমু তুমার আঘে দিআ মাথা ॥ (সংগ্রাসহুসন, পৃ. ৭৫)

এবং

সুন চাচা পানি দেও তরিতে খাইতে ॥
সিঘ্র করি পানি তুমি [দেও] আমি খাই।
পুনরপি সমর করিতে চলি জাই ॥
পানি খাইলে রনে স্বন্য কাটিমু সাহসে।
বার্ত্তা দিতে না রাখিমু এজিদের পাসে ॥
হুসনে কহিলা বাবা পানি নাই এথা।
তুমা দুঃখ দেখি প্রাণি জাউক মর এথা ॥
জদ মাহাম্মদ মর আলি হই বাবা।
হজ কৌসরের পানি তান হাথে পাইবা ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৭৭)

উপরিউদ্ধৃত ছত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশনের প্রাবল্য লক্ষ করি। যেমন : সৈয়দ কাসিম হুসনের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চান। এজন্য কাসিম তাঁর চাচা হুসনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হুসন বিস্মিত হলেন। কারণ মৃত্যুকালে হাসন কাসিমকে হুসনের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তবু কাসিম হুসনের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং যুদ্ধে গেলেন। সেখানে এজিদ সৈন্যদের তিনি হত্যা করলেন। এমতকালে কাসিম তৃষ্ণার্ত হলেন এবং চাচা হুসনের নিকট পানি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর নিকট পানি না থাকায়, হুসন তাঁকে পরলোকের ভরসা হজরত মুহম্মদ (সা:) হজরত আলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন : এঁদের হাতে হজকৌসবের পানি পান করেই পরে তৃষ্ণা মিটাতে পারবে। চাচা হুসনের পরামর্শ মত কাসিম তাঁর তৃষ্ণাজনিত অস্থিরতা পরিহার করলেন। সৈয়দ কাসিম ও হুসনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা সুস্পষ্টরূপে পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন দৃশ্যমান হতে দেখি।

কবি হামিদের 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে অজস্র 'অ্যাকশন', 'রিঅ্যাকশন' ও 'পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন' লক্ষ করা যায়। এজিদ বাহিনীর সঙ্গে সৈয়দ কাসিমের যুদ্ধ হয়েছিল। সে-যুদ্ধে সৈয়দ কাসিম নিহত হলেন। ওই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হুসন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এমতকালে পুরনারীগণের জিজ্ঞাসা খুবই নাটকীয়তার উদ্রেক করে। কবি হামিদ দৃশ্যটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

কান্দিআ আকুল তবে আলীর নন্দন।
ভূমিতে লুটাআ তনু ফাড়িআ বসন ॥
আহা ভাই কথা গেলা প্রাণের সহদোর।
আমাকে অনাথ করি গেলা একস্বর ॥
সার সুকের যুড় ভাই কথা চলি গেলা।
যুড় ভাঙ্গিআ আল্বা কি কারনে নিলা ॥

অনেক বিলাপ করি হুছনে তখনে।
পুরি মধ্যে চলি গেলা তরিত গমনে ॥
উশ্চ স্বরে কান্দিআ কহঞি সব নারি।
কাছিমকে কথা এড়ি আইলা একস্বরি ॥
সুনিয়া হুছনের মুক্ষে না আইসে উত্তর।
আখির জলে ভিগিলেক [তান] কলেবর ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৮০)

উপর্যুক্ত ছত্রসমূহে পুরনারীগণের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। তারা হুসনের নিকট বিলাপ করল। মহান আল্লাহর উদ্দেশে তারা বিলাপ করল। তবু তারা কাসিমকে ফিরে পেল না। এমতকালে হুসনও শোক প্রকাশ করলেন। তবে কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে কেবলি অশ্রু বর্ষিত হল। অতঃপর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। পুরনারীগণ বললে :' কাসিমকে কথা এড়ি আইলা একস্বরি'॥

পুরনারীগণের বিলাপ এখানে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন এবং হুসনের নীরবতা এখানে রিঅ্যাকশন-এর পর্যায়ভুক্ত। উল্লেখ্য যে এ দৃশ্যটিতে মনস্তাত্ত্বিক অ্যাকশনের আধিক্য শনাক্ত করা যায়। কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রাসহুসন'-কাব্যে নাটকীয়তার লক্ষণ রূপে অ্যাকশন, রিঅ্যাকশন ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন বহুদূর বিস্তৃত বলে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি : যেকোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 'অ্যাকশন' ও 'রিঅ্যাকশন' যেমন অভিব্যক্ত হয়েছে, তেমনি 'বাচনিক অ্যাকশন' ও 'পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন'-এর প্রতিফলন মেলে। আলোচ্য 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যটিতেও অজস্র যুদ্ধ ও মৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র আমরা দৃশ্যমান হতে দেখি। আর এখানে 'অ্যাকশন' ও 'রিঅ্যাকশন' যেমন অভিব্যক্ত হয়েছে, তেমনি 'বাচনিক অ্যাকশন' ও 'পূর্ণাঙ্গঅ্যাকশন' প্রকৃত অর্থে বিকশিত ও গতিশীল হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। আর এর ফলে হামিদের 'সংগ্রামহুসন' কাব্যে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে।

(২.২) 'সংগ্রামহুসন'- কাব্যের 'নাটকীয়তা'-র সারোদ্ধার : নাট্যদ্বন্দ্ব

'দ্বন্দ্ব' হল নাটকীয়তার অন্যতম লক্ষণ। আর এ-'নাটকীয়তা' নাটকে চরম থেকে চরমতর পর্যায়ে উপনীত হয়। এর ফলে দর্শক কিংবা পাঠক অতিশয় আগ্রহী হয়ে ওঠে। বস্তুত দ্বন্দ্বের কারণেই কাহিনী ও উপকাহিনী বিভিন্ন দিকে অতিবাহিত হয় এবং অ্যাকশন, রিঅ্যাকশন ও পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন গতিশীল হয়ে ওঠে। সুতরাং দ্বন্দ্বকে নাটকীয়তার অপরিহার্য উপাদান কিংবা লক্ষণ বলে শনাক্ত করা যায়। এ-দ্বন্দ্ববাদের উদ্ভাবক হলেন হেগেল (১৮৮৯- ?)[২১] প্রসঙ্গত বিশিষ্ট নাট্যতত্ত্ববিদ মিল্টন মার্ক্স- এর ভাষ্য স্মর্তব্য :

> The Essence of drama is conflict. Every dramatic situation arises from conflict between two opposing forces.[২২]

দ্বন্দ্ববাদের প্রবক্তা হেগেল বলেছেন যে গতির কারণেই দ্বন্দ্ব গতিশীল হয়ে ওঠে। তাই দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে গতি অসম্ভব। নাটকের কোনো কোনো স্থলে এ দ্বন্দ্বকে অভিব্যক্ত হতে

কিংবা স্তিমিত অবস্থা স্থিত হতে দেখা যায়। আবার নাটকের কোন কোন দৃশ্যে দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টরূপে শনাক্ত করা যায়। মূলত দ্বন্দ্বের আধিক্যের ফলে নাটকে অধিক নাটকীয়তা সৃষ্ট হয়। আবার দ্বন্দ্বের অপ্রাচুর্যের কারণে নাটকে কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা লক্ষিত হয়।[২৩] তৎপরবর্তীকালে ফার্দিনান্দ ব্রনেতিয়ে[২৪] হেগেলের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন। স্মরণযোগ্য : দ্বন্দ্বের বাহ্যরূপ হল অ্যাকশন।[২৫] তাই অ্যারিস্টোটল অ্যাকশনের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে তাঁর 'Poetics'- শিরোনামার গ্রন্থে তিনি কোথাও দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেন নি।[২৬]

নাটকে দ্বন্দ্বের গুরুত্ব অধিক বলেই যে দ্বন্দ্ববিহীন নাটক রচিত হবে না, এমন কোনো বিধি নেই। দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেও নাটক রচিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তন চেখভের (১৮৬০-১৯০৪)[২৭] 'The Cherry Orchard'- নাটকটির কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এ নাটকে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে রেমন্ড হুলের[২৮] ভাষ্য অনুযায়ী এতে দ্বন্দ্বের প্রকৃত উদাহরণ মেলে। তাঁর ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

Boy wants girl; boy gets girl.[২৯]

এখানে কোনো 'দ্বন্দ্ব' নেই। সুতরাং এটি নাটক নয়। তিনি আরও বলেছেন :

Boy wants girl; girl's parents oppose the match.[৩০]

উপর্যুক্ত ভাষ্যে দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হয়। অতএব এখান থেকেই নাটকের সূচনা হতে পারে। মিল্টন মার্ক্সের ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> Every dramatic Situation represent a phase of the larger conflict that is the theme of the play.[৩১]

মিল্টন মার্ক্স তিন ধরনের দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩২] আর সেগুলো নিম্নরূপ :

(ক) এ দ্বন্দ্ব খুবই সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। দুজন ব্যক্তির মধ্যে এ দ্বন্দ্ব ঘটে থাকে। মূলত 'নায়ক' ও 'খলনায়ক' মুখোমুখিভাবে তীব্রগতিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ সংগ্রাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈহিক অ্যাকশনে পরিণত হয়। নাটকে সর্বত্র দুজন ব্যক্তির মধ্যে এ দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি)[৩৩] 'Hamlet'- নাটকে 'হ্যামলেট' ও 'লেয়ের্টস'- এর মধ্যে এ দ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর 'Romeo and Juliet'- নাটকে 'হ্যামলেট' ও 'টাইবাল্ট'- এর মধ্যে এ দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।[৩৪] স্মরণযোগ্য : রেমন্ড হুল এ দ্বন্দ্বকে 'Man Against Man'[৩৫] কিংবা 'মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বন্দ্ব' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(খ) এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তি এবং বাহ্যশক্তির মধ্যে লক্ষিত হয়। 'বাহ্যশক্তি' হল : সমাজ (Society), অতিপ্রাকৃত প্রাণী বা বস্তু (Supernatural), ও নিয়তি (Destiny or Fate)। দৃষ্টান্তস্বরূপ হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬ খ্রি)[৩৬]-এর An enemy of the people নাটকে ডাঃ স্টকম্যান ও শহরের নাগরিকগণের মধ্যে 'দ্বন্দ্ব' সুস্পষ্টরূপে লক্ষ করা যায়। আবার আধুনিক কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজের সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজের

দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হয়।[৩৭] এ দ্বন্দ্বকে রেমন্ড হুল Man against Society[৩৮] কিংবা 'মানুষের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব' বলে শনাক্ত করেছেন।

(গ) এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এর প্রকৃত উদাহরণ হল শেক্সপিয়রের 'Hamlet' নাটকটি। এ নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব 'Hamlet's Mind'-অর্থাৎ হ্যামলেটের নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব।[৩৯] এছাড়া 'A Doll's House'[৪০]-নাটকে 'নোরা'-র স্বামীর সঙ্গে নোরার সংঘাত ঘটে থাকে। এ সংঘাত থেকে নোরা কেমন করে নিজেকে রক্ষা করবে? নোরার নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ দ্বন্দ্বকে রেমন্ড হুল 'Man Against Himself'[৪১] কিংবা 'নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব' বলে শনাক্ত করেছেন। উপর্যুক্ত দ্বন্দ্বগুলো 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যেও লক্ষ করা যায়। যেমন :

আর কথা কহি পুত্র সুন মন দিআ।
তর বিবাহের স্থান না দেখ ভাবিআ ॥
তুমার মনেত মানে কুলিন জেই জন।
কহ কথাতে আছে কথা তর মন ॥
এজিদে কহএ তুমি সুন মহাসএ।
আবদুল্বা যুবক এক পুরস আছএ ॥
তার নারি জয়নব পরম সুন্দরী।
নিকাহা করায় মকে তানে জত্ন করি ॥
সুনি পুনি মাহাবিআ লাগীল কহিতে।
পুরুস থাকিতে নারি বরিব কেমতে ॥
এরে সুনি এজিদে বোল এ আরবার।
হেলাএ ছাড়াইমু তারে নাহিক বিচার ॥
জার লাগি অনুক্ষণ কাম দেহা দহে।
জার লাগি অঙ্গের লহু পানি হৈআ বহে ॥
জার লাগি ছেল মর পসিল হৃদয়।
দিবানিসি কামবানে অন্ত্বরে দহয় ॥
সেহ নারির সঙ্গে জদি না হএ মিলন।
অগ্নিতে প্রবেস করি তেজিমু জিবন ॥
সেই বিনে জিবন মরন হেন জান।
সেই হনে মর মনে না ভাবএ আন ॥
কিরূপে সে রূপে মর লাগিল আখিতে।
উপিমার সিমা জার না দেখ জগতে॥
সেই জয়নব নব বয়স তাহান।
জার বানী সুনি মধু অমৃত্ত সমান ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৫)

উপরিউল্লিখিত ছত্রসমূহে মাহাবিয়া ও এজিদের মধ্যে কথোপকথন পরিদৃষ্ট হয়। মাহাবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এজিদ বিবাহ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সে আবদুল্লাহর পরমাসুন্দরী স্ত্রী জয়নবকে বিবাহ করার আগ্রহ ব্যক্ত

করল। জয়নবকে না পেলে সে আর কোনো নারীকে বিবাহ করবে না বলে জানাল। এমতকালে মাহাবিয়া খুবই ভাবনাগ্রস্ত হলেন। মাহাবিয়া বংশ রক্ষার জন্য জয়নবের সঙ্গে এজিদের বিবাহ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু 'জয়নব' আবদুল্লাহর স্ত্রী হওয়ায় এ বিবাহ সম্ভব নয়। তাই জয়নব ও আবদুল্লার মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। এজন্য মাহাবিয়া ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলেন। এ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এ কাব্যে 'দ্বন্দ্ব'-এর সূচনা হয়। এ দ্বন্দ্বকে 'মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বন্দ্ব'-বলে শনাক্ত করা যায়। এরপর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে আরও কতিপয় দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। যেমন :

তুমি এজিদের সনে যুক্তি করিআ।
আবদুল্বা যুবকরে আন ডাক দিআ ॥
তরিত করিআ মন্ত্রি তাকে আনাইল।
কহন্তি জত কথা পৃতি[তে] কহিল ॥
রাজার দুহিতা এজিদের ভগীনি।
তুমা সঙ্গে রঙ্গে বিহা দিবা নৃপমনি ॥
রাজার হইবাএ জামাই এজিদের ভগ্নিপতি।
রাজ্য কার্য্য তুমাতে দিবেক জত ইতি ॥
ধনজন পাইবা বহু নানা জাতি লোক।
হাথি ঘোড়া পাইবা আদি মিছ্যিরি মুলুক ॥
উট গাধা মেস ছাগ খাছর বলদি।
গনিয়া কে পারে তারে করিতে অবধি ॥
তাম্বু সামেনা কানাত জত ইতি।
দুম্বা গাভি আর মইস জত ইতি ॥
রাজকৈন্যা সহজে বিসেসে ধনবন্ত।
সুনা[হা] সুগন্ধ জত[কি] কৈব অন্ত ॥
সুনি চিত্ত হরসিত হৈল গরুতর।
কহিমু করিআ কালি দিলেক উত্তর ॥
বিদায় করিয়া তবে আবদুল্বা যুবরে।
আপনার সুক্ষে চলি গেলা নিজ ঘরে ॥
নির্ব্বহিলা রজনি দিনমনির উদয়।
প্রভাতে সভাতে মিলিলেক লুকচয় ॥
আবদুল্বা যুবক তবে মনে দঢ় করি।
সন্ত্রসে চলিআ আইলা নৃপতির পুরি ॥
মন্ত্রি ডাকি আবদুল্বা কহিল সত্তরে।
নৃপতির ইছ্যা জেই করিমু তাহারে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৬)

উপর্যুক্ত ছত্রসমূহে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হল। মাহাবিয়ার নির্দেশে মন্ত্রী আবদুল্লাকে রাজদরবারে নিয়ে এল। তারপর একান্তে তাকে অনেক কিছু বলা হল। রাজার দুহিতার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবও দেওয়া হল। এ বিবাহ সম্পন্ন হলে আবদুল্লা অনেক কিছু পাবে। রাজ্যের অনেক লোক তাকে সম্মান করবে। প্রলুব্ধ আবদুল্লা এতে অতিশয় আগ্রহী হল এবং রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহের ইচ্ছা ব্যক্ত

করল। কিন্তু জয়নবকে স্ত্রী রূপে রেখে আবদুল্লাহ রাজকন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না। তাই সে তার স্ত্রী জয়নবকে পরিহার করল। স্মরণযোগ্য : মাহাবিয়াপুত্র এজিদের জয়নবকে পাওয়ার অভিলাসের কারণে আবদুল্লাকে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হল। মূলত জয়নবকে পাওয়ার জন্য আবদুল্লা ও মাহাবিয়া পুত্র এজিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হল। অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার জন্য দুজন পুরুষলোকের মধ্যে এখানে দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হল। আর এখান থেকেই এ দ্বন্দ্ব আরও প্রসারিত হল। এ দ্বন্দ্বকে 'মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব'-বলে শনাক্ত করা যায়। প্রলুব্ধ আবদুল্লা তার স্ত্রী জয়নবকে পরিত্যাগ করবে। এ কথা শুনে রাজকন্যা বলল :

...তবে ই সকল সুনি ॥
রাজলুভে ধনলুভে লুভিআ বিসেসে।
জয়নব হেন নারি তেজিলায় কুন দুসে ॥
কদাচিত্ত আমিও হইমু ধনে হিন।
তবে তাঞি আমারে তেজিবা সেই দিন ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৭)

রাজকন্যার এ উক্তির মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হল। স্মরণযোগ্য : পরমাসুন্দরী কন্যা 'জয়নব'-কে পরিত্যাগ করার পরেও রাজকন্যার সঙ্গে প্রলুব্ধ আবদুল্লার বিবাহ সম্পন্ন হয় নি।

এরপর জয়নবকে বিবাহ করার জন্য এজিদ 'মুসা আশআরী'-কে ঘটক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। মুসা আশআরী জয়নব গৃহাভিমুখে যাত্রা শুরু করল। পথিমধ্যে হাসনপুত্র কাসিমের সঙ্গে মুসার দেখা হল। কাসিম বললেন :

...সুন মুসা আছআরী।
আমার আছএ আসা তানে নিকাহা করি ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৮)

এরপর মুসা আশআরীর সঙ্গে হুসনের দেখা হল। হুসন বললেন :

...মুছা তুমি মতিমান।
কহিবাএ আমারে কথা জয়নবের স্থান ॥
আমাকে বরিতে জদি হএ তান মতি।
দঢ়াইআ তুমাতে জেন কহঞি সম্প্রতি ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৯)

মুসা আছআরী জয়নব গৃহে প্রবেশ করল। সে জয়নবের নিকট বিবাহের তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করল। বররূপে প্রস্তাবিত তিনজন ব্যক্তির মধ্যে জয়নব হুসনকেই তাঁর পতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন :

রায্য ভুগ সুক্ষ কিছু নাহি মর চিত্তে ॥
সুন্দর যুবক কিছু নাহি মর কাজ।
ইহলোকে পরলোকে হুছন সমাজ ॥
হুছনের স্থানে মরে নিকা দেও নিয়া।
আন আসা হনে তুমি জাও ভ্রষ্ট [হে] আ ॥
মুছা[আছ] আরি তবে সুনিআ ই সব।
হুছনের স্থানে নিকা দিলেক জয়নব ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫১)

তারপর হুসন ও জয়নবের বিবাহ সম্পন্ন হল। এতে এজিদ খুবই ক্রোধান্বিত হল। এর ফলে এ কাব্যে দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হল। জয়নব ও হুসনকে কেন্দ্র করে এজিদের দ্বন্দ্ব(=ক্রোধ) ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। এ দ্বন্দ্বকে 'মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব' বলে চিহ্নিত করা যায়।

'সংগ্রামহুসন' কাব্যে এজিদ কর্তৃক হাসন হুসন বধের চক্রান্ত পরিদৃষ্ট হয়। হাসনকে বধ করার জন্য এজিদ কুটনী বুড়ীকে নিযুক্ত করল। অতঃপর কুটনী বুড়ী হাসন গৃহে প্রবেশ করল এবং হাসন স্ত্রীকে কুমন্ত্রণা দিল। এ কুমন্ত্রণায় হাসন স্ত্রী মুগ্ধ হল। একদিন হাসন ও হুসন দুই ভাই শিকার করতে গেলেন। সেখানে তারা তৃষ্ণায় কাতর হলেন এবং গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। হাসন তার স্ত্রীকে পানি দিতে বললেন। হাসন স্ত্রী কুটনী বুড়ীর বিষগুলী মিশ্রিত গ্লাসভর্তি পানি হাসনকে দিলেন। হাসন পানি খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। অতঃপর কুটনী বুড়ীর চক্রান্ত বুঝতে পেরে হাসন স্ত্রী কাঁদলেন। হুসন কাঁদলেন। কিন্তু হাসন ফিরে এলেন না। হাসনের মৃত্যু সংবাদ শুনে এজিদ খুবই খুশি হল। অতঃপর হুসনকে হত্যা করার জন্য এজিদ নির্দেশ দিল। এজন্য এজিদ সৈন্য প্রেরণ করল এবং হুসনকে চরমপত্র দিল। এর ফলে হুসন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

এজিদ চিন্তিত হল। কারণ হুসনকে হত্যা করা অতি সহজ নয়। হুসনকে মদিনা থেকে সরানোর জন্য তাই এজিদ ষড়যন্ত্র শুরু করল। এ কারণে কুফাবাসীদের দিয়ে একটি পত্র হুসনের নিকট পাঠানো হল। কুফাবাসীদের ওই পত্রে ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। পত্রটির ভাষ্য স্মর্তব্য :

নবির স্মরন তুমি আইসএ এথাতে।
আমি সবে জিব দিমু তুমার সহিতে ॥
এজিদের ভএ তুমি না ভাবিয় চিত্তে।
নির্ভএ যুঝিমু আমি তুমার নিমিতে ॥
রছুলের নাতি তুমি মুমিনের আঁখি।
প্রানপনে যুঝিমু তুমারে মাঝে রাখি ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৬১)

এ ছলনা হুসন বুঝতে পারলেন না। ফলে তিনি কুফার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন আর এ সংবাদ পেয়ে এজিদ তার সৈন্যদের হুসনের গতিপথ অনুসরণ করতে বলল কবি হামিদ তার 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এ দৃশ্যটির বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন :

সাগর তরঙ্গ হেন চলে সেনাগন।
খাণ্ডা সব ধরে করে আর সরাসন ॥
স্বন্য সেনাপতি সব একত্র হইআ।
হুছনের পিছে২ চলিলা ধাইআ ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৬৫)

এরপর হুসনের সঙ্গে এজিদ সৈন্যগণের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এ- যুদ্ধে হুসনের স্বপক্ষগণ প্রায় সকলেই নিহত হলেন। অতঃপর হুসনের শিশুপুত্র আলী আসগর তাঁর চাচা হানিফার গৃহে এলেন। তিনি বললেন :

বাপ চাচা দুই জে হইল মরন।
এজিদের সনে বাপে কৈলা মহারন ॥
চাচা হাছনকে মারিল বিস দিআ।
ইষ্ঠ মিত্র সব গেলা সমরে যুঝিআ ॥
আমি সে এতিম ছিলাম দস্ত কর্ব্বলাতে।
উদ্দেস করিআ আইলু তুমার চরনেতে ॥
তুমি বিনে লক্ষ নাহি এতিন ভূবন।
সমর্পিআ গেছঞি বাপে ইস্বর চরন ॥
সুনি সুগে অচেতন হৈল নৃপবর।
দেখি পাত্রমিত্র জত হইলা ফাপর ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ১১৪)

আলী আসগরের কথা শুনে মুহম্মদ হানিফা খুবই রাগান্বিত হলেন এবং এজিদকে বধ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। এ কারণে মুহম্মদ হানিফা ও এজিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হল। মুহম্মদ হানিফা এবং এজিদ বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে এজিদ বাহিনীর পরাজয় ঘটল। অতঃপর হাসন হুসন বধের প্রতিশোধ নিতে সম্ভবত হানিফা এজিদকে হত্যা করলেন। স্মরণযোগ্য : মুহম্মদ হানিফা ও এজিদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়, তাকে 'মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বন্দ্ব'- বলে আখ্যায়িত করা যায়। 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে বিবি জয়নবকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্বসমূহের সূচনা হয়েছিল, এজিদ-হত্যার মধ্য দিয়ে সেগুলোর অবসান হল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় : 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে 'মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বন্দ্ব' নানা প্রকারে পরিস্ফুট হয়েছে। আর এর ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে 'নাটকীয়তা'ও ঘনীভূত হয়েছে।

(২.৩) 'সংগ্রামহুসন- কাব্যের 'নাটকীয়তা'-র সারোদ্ধার : নাট্য উৎকণ্ঠা

নাটকীয়তার অন্যতম লক্ষণ হল 'উৎকণ্ঠা'। নাটকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়ে কতিপয় ঘটনা সৃষ্টিতে অগ্রসর হন। এ-অগ্রসরমান ঘটনা উৎকণ্ঠা থেকেই বিকশিত হয়। আর এর সাহায্যে নাট্যকার দর্শকচিত্ত জাগ্রত রাখেন। নাটকে ঘটনার অসম্পূর্ণতা এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের মধ্যবর্তী স্থলে দর্শক এক প্রকার 'চাপ' অনুভব করে। কারণ এসময় নাটকের ঘটনাক্রম পরিবর্তিত হয়ে যে কোনো দিকে প্রবাহিত হতে পারে। অবশ্য এ পরিস্থিতিটিকে দর্শক 'চাপ' হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। ফলে নাটকের 'শেষ' দেখার জন্য দর্শকচিত্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠে।[৪২] আর এসব কিছু কেবলি উৎকণ্ঠার কারণেই পরিদৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি সদৃশ বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। একটি ভাঙ্গাসেতুর উপর দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছে। গাড়িটি খুব দ্রুত বেগে চলছে। গাড়িটির ড্রাইভার ভাঙ্গাসেতুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ রয়েছে। সে নিশ্চিত মনে গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু দর্শকচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কারণ ভাঙাসেতুটি সম্পর্কে দর্শক পূর্ব থেকেই অবহিত আছে। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়[৪৩] উৎকণ্ঠার দুটি শ্রেণীবিভাগ[৪৪] করেছেন। সে বিভাগগুলো নিম্নরূপ :

(ক) অনিশ্চয়তামূলক উৎকণ্ঠা :

এখানে নাটকের ঘটনার পরিণাম সম্পর্কে দর্শক নিশ্চেতন থাকে। অর্থাৎ নাট্যঘটনা কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে, সে সম্পর্কে দর্শক কিছুই জানে না। এ সময় দর্শকের হৃদয়মান কেবলি উত্তেজিত থাকে।

(খ) পূর্বাভাষমূলক উৎকণ্ঠা :

এখানে নাটকের চরিত্রগুলো কিংবা ঘটনাক্রম সম্পর্কে দর্শক কিঞ্চিৎ অবহিত থাকে। কিন্তু নাটকের চরিত্রগুলো এ-সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে অনবহিত থাকে। অবশ্য দর্শক যে-ঘটনাগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিল, সেগুলো নাটকের চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক গতিপথে কখন এসে দৃশ্যমান হবে, এ উৎকণ্ঠায় দর্শক চিত্ত ব্যাকুল থাকে।

গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেস[৪৫] তার 'Oedipus Rex'-নাটকে চমৎকারভাবে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছেন। এ নাটকে 'অয়দিপাউস' চরিত্রটি তার মাতাকে বিবাহ করে। পরবর্তিকালে তাদের দুটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু তাদের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে তারা পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকে। অবশ্য ওই নাট্যঘটনা সম্পর্কে দর্শক অবহিত আছে। দৈববাণীর ফলে অয়দিপাউস সত্যঘটনা উদ্‌ঘাটন করতে চায়। নাটকের শেষে এ সত্য ঘটনাটি উদ্‌ঘাটিতও হয়। এ নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকচিত্ত উৎকণ্ঠার জন্য কৌতূহলী অনুভব করে। এ অবস্থাটিকে 'পূর্বাভাষমূলক উৎকণ্ঠা' বলে শনাক্ত করা যায়। কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এরকম অজস্র 'উৎকণ্ঠার' পরিচয় মেলে। এ কাব্য থেকে উৎকণ্ঠার কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল :

রসুল মুহম্মদের দুই নাতির নাম : 'হাসন' ও 'হুসন'। এই দুই নাতির সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করছিলেন। এমতকালে স্বর্গীয় দূত জিবরাইল সেখানে এলেন। অতঃপর রসুল-মুহম্মদকে তিনি পূর্বাভাষ শোনালেন। এ পূর্বাভাষ হল : 'হাসন' ও 'হুসন' বৈরিহস্তে নিহত হবেন। পরবর্তিকালে একদিন রসুল মুহম্মদ পাত্র মিত্র নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময়ে তার একজন মুখ্য অমাত্য মাহাবিয়া এসে তার পদ চুম্বন করে আসন গ্রহণ করলেন। এমতকালে রসুল মুহম্মদ বললেন : তোমার ঘরে একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং সে-ই আমার হাসন-হুসনকে বধ করবে। একথা শুনে মাহাবিয়া বিস্মিত হলেন এবং বললেন : এটি সম্ভব নয়। কেননা তিনি অদ্যাপি অবিবাহিত।[৪৬] কবি হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে নিম্নোক্তভাবে উল্লিখিত ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন :

রছুল কহিলা তবে সুন মাহাবিআ
তর ঘরে পুত্র এক জন্মিবে আসিআ ॥
সেই মর হাছন হুছন কাটিবারে।
তুমা হনে জন্মি সে জে আসিব সংসারে ॥
মাহাবিআ কহিলেক সুন পয়াম্বর।
পুত্র নাহি ধরু মুই সংসার ভিথর ॥

ইশ্বরেত সেই বংস না করূ মাগন।
জেই হনে হৈব তুমার বংসের মরন ॥
দিব্য করি কহু মুই নিচ্যিতে তুমার
আজি হনে স্ত্রি পাসে না জাইমু আর ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪১-৪২)

উপর্যুক্ত 'পূর্বাভাষ' এর মধ্য দিয়ে নাটকীয়তার লক্ষণ উৎকণ্ঠার সূচনা পরিদৃষ্ট হয়। কারণ পূর্বাভাষ এর মধ্য দিয়ে দর্শক চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তৎপরবর্তিকালে, নবী ও চার খলিফার পরে, মাহাবিআ রাজ্য লাভ করেন। একদা মাহাবিয়া দেওয়ালের পাশে মূত্রত্যাগ করতে গেলেন। সেখানে একটি সর্প তাকে দংশন করল। অধিকাংশ বৈদ্য বলল যে এ-সর্পবিষ থেকে জীবন রক্ষা করতে হলে মাহাবিয়াকে বিবাহ করতে হবে। অন্যথায় মাহাবিয়ার জীবন বাঁচানো সম্ভব নয়। অনেক ভাবনা-চিন্ত্বা করার পর মাহাবিয়া একজন জরাগ্রস্ত্ব নারীকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন।

উপরিউল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের নাটকীয় 'উৎকণ্ঠা' সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কারণ মাহাবিয়াকে সর্পদংশন করা এবং তাঁর জীবনরক্ষাহেতু বিয়ে করা প্রসঙ্গ,- এঘটনাগুলো মধ্যে দিয়ে দর্শকচিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এর কারণ বস্তুত 'পূর্বাভাষমূলক উৎকণ্ঠা'। [এ পূর্বাভাষ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।] আর এ পূর্বাভাষের মাধ্যমে উৎকণ্ঠা বিকশিত হয়েছে। 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে উল্লিখিত ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ :

নাড়ি ধরি বৈদ্য সবে লাগিলা কহিতে।
রতি রস কর রাজা রমনি সহিতে ॥
সুনিয়া কহিলা রাজা বিরস বদন।
পুনি না করিমু আর নারিতে রমন ॥
তাহা সুনি পাত্রগনে কহিলা সত্তর।
কার্য্য আযু রমন তুমি কর নৃপবর ॥
এত সুনি মাহাবিআ বোলে ধির করি।
কিহ্নআ আনহ তুমি বৃদ্ধ এক নারি ॥
নগরেতে দূত সবে গেলা তরাতরি।
কিহ্নিআ আনিআ দিলা ব্রিদ্ধ এক নারি ॥
সেই নারি অতিসয় বৃদ্ধ কলেবর।
দেখিতে বিকৃত্ত সেই নয়ন গুচর ॥
দেখিআ কহিল রাজা বিরস বদনে।
নিকা বান্ধি দেও মরে মিলি সর্ব্বজনে ॥
অনুচরগনে সুনি রাজার বচন।
নিকা বান্ধি দিলা সবে প্রসন্ন বদন ॥
ততক্ষনে তান সনে করিলা রমন।
বিষ নাস হৈল রাজা পাইলা চেতন ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৩)

উপর্যুক্ত কাব্যাংশে 'বৃদ্ধ নারী'-রূপে দ্বাদশ বছরের কন্যার আগমন এবং মাহাবিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ, অতঃপর পুত্র 'এজিদ'-এর জন্মগ্রহণ, এ ঘটনাগুলো প্রকৃত অর্থেই

দর্শকচিত্তকে কৌতূহলী করে তোলে। আর এখানেই 'উৎকণ্ঠা' সৃষ্টি হয়। স্মরণযোগ্য : 'সংগ্রাহুসন'-কাব্যে 'এজিদ'-চরিত্রটির মধ্য দিয়ে 'উৎকণ্ঠা' বিকশিত হয়েছে। কারণ 'পূর্বাভাষ'-অনুযায়ী এজিদ কর্তৃক 'হাসন-হুসন' নিহত হবেন। এরপর মাহাবিয়া খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন :

নিবন্ত কারণে হেতু এসব ফলিল ॥
সেই দিনে সেই নারি গর্ভ [জে] ধর এ।
দিনে ২দসমাস [কাল] পুর্ন্ন হএ ॥
তবে সেই রজে নারি গুন প্রসবিল।
বিস্ব হনে বিস [হ]য় এজিদ জন্মিল ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৪।)

এরপর মাহাবিয়া কেবলি রসুলের বাণী স্মরণ করলেন এবং চিন্তিত হলেন। 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এজিদ হাসন বধ লক্ষ্যে কুটনী বুড়ীকে নিয়োগ করল। এজিদ বলল :

এক কথা কহি নানি সুন দিআ মন ॥
বিস্য দিআ হাছন জদি পার মারিবার।
গাউ ভুই ধন দিমু তুমি খাইবার ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৩)

কুটনী বুড়ি এর উত্তরে বলল :

'সুনিআ ডানিএ বোলে ই কর্ম্ম আমার' (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৩)

এরপর বুড়ী দ্রুতবেগে তার গৃহে গেল। সেখান থেকে বুড়ী বিষগুলী নিল এবং হাসনগৃহাভিমুখে গমন করল। হাসনস্ত্রী তাকে 'নানী' সম্বোধন করলেন। এরই সুযোগে কুটনী বুড়ী ছলনার আশ্রয় নিল। বুড়ী হাসনস্ত্রীকে বিষগুলীটি দিল। এ বিষগুলীটি, গ্লাসভর্তি পানিতে মিশ্রিত করে, বুড়ী হাসনকে খাওয়াতে বলল। বুড়ীর কথামত হাসনস্ত্রী হাসনকে ওই পানি খাওয়াল। আর এখানেই 'উৎকণ্ঠা' প্রস্ফুটিত হল। কারণ হাসনের পানি খাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শকচিত্ত কৌতূহলী থাকে। আর এর কারণ গ্লাসভর্তি বিষমিশ্রিত পানি। দর্শক এটি জানে। কিন্তু হাসন ও তার স্ত্রী একথা জানেন না। কবি হামিদ, তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে বুড়ীর 'বিষগুলী'-র সাহায্যে 'উৎকণ্ঠা' বিকশিত করেছেন।

এ কাব্যের 'শঙ্কিত এজিদ কর্তৃক হানিফার পরিচিতি সন্ধান : হানিফার আত্মপরিচয় দান'- বিষয়ক ছত্রগুলোতেও 'উৎকণ্ঠা' প্রত্যক্ষ করা যায়। এসব ছত্র-অনুযায়ী দেখা যায় : এজিদ কৌতূহলী হয়ে উঠল। তাই তার উজিরকে সে হানিফার পরিচয় জানতে বলল। হানিফার নিকট গিয়ে উজির বলল :

কি নাম তুমার তুমি কাহার তনয়।
কথা হনে আসিআছ জাতি কিবা হএ ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ১২৩)

হানিফা এর উত্তরে বললেন :

এই বার ভাই আমি আলীর নন্দন ॥
মাহাম্বদ হানিফা নাম জানহ আমারে।
আসি আছি হাছন হুছন দেখিবার ॥

তান দাদ লই কিবা সঙ্গি হই তান।
এই কার্য্যে আমি জে আসিছি এই স্থান ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ১২৩)

উপর্যুক্ত কথোপকথনে 'উৎকণ্ঠা' পরিদৃষ্ট হয়। এজিদকে হত্যা করার জন্যই মুহম্মদ হানিফার এজিদরাজ্যে আগমন। তবে এজিদ কর্তৃক হাসনহুসন বধের প্রতিশোধ নিতেই যে মুহম্মদ হানিফার এই আগমন, – এ কথা এজিদ জানত না। কিন্তু এ কথাটি দর্শক জানে। এখানেই উৎকণ্ঠা সৃষ্ট হয়েছে। 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের পূর্বোক্ত ছত্রসমূহ থেকে 'উভয়পক্ষে যুদ্ধ'-শীর্ষক কবিতাংশের ছত্রগুলো পর্যন্ত উৎকণ্ঠা-ঘটিত তীব্র উত্তেজনা লক্ষ করা যায়। এ যুদ্ধের বিবরণ নিম্নরূপ :

দুইখান হৈআ বর্য্য পড়িল ভুমিতে ॥
দেখি এজিদের জত পএলআনে সত্তর।
একত্রে মারিলা ঘোড়া হাবাছ উপর ॥
চারিদিঘে হৈআ লাগীলা মারিবার।
দেখিআ না কৈলা সঙ্কা আলির কুমার ॥
ক্রোধ করিআ বান মারঞি চারিভিতে। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ১৩০)

উপর্যুক্ত ছত্রসমূহে দেখা যায় : মুহম্মদ হানিফা ও তার বাহিনীর সঙ্গে এজিদবাহিনীর যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে হানিফা বিজয়ী হলেন। স্মরণযোগ্য : হানিফার বিজয়ী হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ এজিদ বাহিনীর পরাজয়ের পর দর্শকচিত্তে আর কোনো উত্তেজনা ঘনীভূত হয় নি। সুতরাং 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে এজিদ এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে 'উৎকণ্ঠা'-র যে সূচনা, তার পরাজয় তথা মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কেবল সে 'উৎকণ্ঠা'-র পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(২.৪) 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের নাটকীয়তার সারোদ্ধার : নাট্যশ্লেষ

'নাট্যশ্লেষ' হল নাটকীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এক্ষেত্রে অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ বিশেষ এক ধরনের সংলাপ বলে ও আলাদা রকমের আচরণ করে। নাটকে, অনেক সময়ে, পূর্বে এমন ঘটনা ঘটে, যেজন্য, তারপরে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোনো বিশেষ ধরনের সংলাপ বলা ঠিক নয়। অথচ পূর্ববর্তী ঘটনা সম্পর্কে দর্শকগণ অবহিত আছে বলেই তারা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আচরণের সত্যতা অনুধাবন করতে পারে। এভাবে নাট্যঘটনার সত্যতার ব্যাপারে অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং দর্শকদের মধ্যে যখন দূরত্ব তৈরি হয়, তখনই 'নাট্যশ্লেষ' সৃষ্ট হয়।[৪৭] এ-নাট্যশ্লেষ প্রধারণত দু'রকমের হয়ে থাকে।[৪৮] সেগুলো নিম্নরূপ :

(ক) ঘটনাগত নাট্যশ্লেষ
(খ) বাচনিক বা শব্দগত নাট্যশ্লেষ।

উপর্যুক্ত নাট্যশ্লেষগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যায় :

(ক) ঘটনাগত নাট্যশ্লেষ :

ঘটনাগত নাট্যশ্লেষ এ রকম : নাটকের কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে দর্শকগণ আগে থেকেই জ্ঞাত আছে, কিন্তু ওই নাটকের চরিত্রসমূহের কাছে তা অজ্ঞাত। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

গ্রিকনাটকের কথা বলা যায়। সোফোক্লেসের 'Oedipus Rex'-নাটকের 'অয়দিপাউস'- চরিত্র যখন তার মাকে বিবাহ করে, তখন চরিত্রদ্বয় পরস্পর অপরিচিত। কিন্তু তাদের পরিচিতি সম্পর্কে দর্শক সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। ফলে নাট্যঘটনা তথা চরিত্রদ্বয় এবং দর্শকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। আর এখানেই 'ঘটনাগত নাট্যশ্লেষ' পরিস্ফুট হয়। স্মরণযোগ্য : গ্রিক নাটকে 'ভাগ্যের পরিহাস'-এর বিষয়টি প্রায়শ লক্ষ করা যায়। এরূপ 'ভাগ্যের পরিহাস'-এর মধ্য দিয়ে সেখানে নাট্যশ্লেষ সৃষ্ট হয়েছে।

(খ) বাচনিক বা শব্দগত নাট্যশ্লেষ :

নাটকের কোনো চরিত্র, অনেক সময়, স্বগতোক্তি করে বা আত্মগত সংলাপ বলে। এসব স্বগতোক্তিকে আশ্রয় করে ওই চরিত্র ও দর্শকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। আর তখনি 'বাচনিক বা শব্দগত নাট্যশ্লেষ' সৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ : শেক্সপিয়রের 'Othello'-নাটকের কথা বলা যায়। এ নাটকে ওথেলো ইয়োগোকে সবসময়ই সৎ বলেছে। কিন্তু দর্শকদের নিকট ইয়োগো অত্যন্ত 'অসৎ' কিংবা দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে পরিচিতি লাভ করেছে। স্মরণযোগ্য : নাটকের অভিনয়কালে কাহিনীর শুরুতে কিংবা এর বিকাশে কিংবা এর সমাপ্তিতে নাট্যশ্লেষ উপলব্ধি করা যায়। গ্রিকনাটকের ক্ষেত্রে প্রোলগ, ভবিষ্যৎবক্তা কিংবা কোরাসের মাধ্যমে, অধিকাংশ সময়েই, কোনো ঘটনার মূল অভিপ্রায় দর্শকদের জানানো হতো।[৪৯]

'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে নাট্যশ্লেষের দৃষ্টান্ত মেলে। এ কাব্যের 'হাসন-হুসনের করুণ মৃত্যুর পূর্বাভাষ'-শীর্ষক কবিতাংশ এর উদাহরণস্থল। এখানে হাসন-হুসনকে নবী উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দিতে পেরে খুবই খুশি হলেন। এমন সময় স্বর্গীয় দূত জিবরাইল এলেন। তিনি নবীকে হাসন-হুসনের করুণ মৃত্যুর পূর্বাভাষ জানালেন। এ পূর্বাভাষটি নিম্নরূপ :

সুন পয়াম্বর মর কথাতে দেও মন।
দয়া না করি[য়া] বহু হাছন হুছন।
এই দেখ ছজ রঙ্গ হাছনের পাহন।
বিসে ছজ হৈআ তেজিবা জিবন ॥
দেখ রাঙ্গা চির সুভে হুছনর অঙ্গে।
খড়্গ ঘাএ র্জর২ হৈব তান সঙ্গে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৩৯)

উপর্যুক্ত 'পূর্বাভাষ' প্রকৃত সত্য-রূপে প্রতিভাত হয়েছে বলেই নাট্যশ্লেষ সৃষ্ট হয়েছে।

এরপর 'মাহাবিয়ার প্রতি নবী মুহম্মদ'-কবিতাংশে 'বাচনিক বা শব্দগত নাট্যশ্লেষ' লক্ষ করা যায়। নবী পাত্রমিত্র নিয়ে দরবারে বসেছিলেন। এমন সময় তার একজন মুখ্য অমাত্য মাহাবিয়া এলেন। তাকে লক্ষ্য করে নবী বললেন :

...সুন মাহাবিআ।
তর ঘরে পুত্র এক জন্মিব আসিআ ॥
সেই মর হাছন হুছন কাটিবারে।
তুমা হনে জন্মি সে জে আসিব সংসারে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪১)

মাহাবিয়া এর উত্তরে বললেন :

...সুন পয়াম্বর।
পুত্র নাহি ধরূ মুই সংসার ভিথর ॥
ইশ্বরেত সেই বংস না করূ মাগন।
জেই হনে হৈব তুমার বংসের মরন ॥
দিব্য করি কহু মুই নিচ্যিতে তুমার।
আজি হনে স্ত্রি পাসে না জাইমু আর ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪১-৪২)

উপরিউল্লিখিত ছত্রগুলোতে নাট্যশ্লেষ দৃশ্যমান হতে দেখা যায়। এখানে নবীর স্নেহভাজন দৌহিত্রদ্বয় হাসন-হুসনের মৃত্যুর পূর্বাভাষ উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ মাহাবিয়ার সন্তান কর্তৃক হাসন ও হুসন নিহত হবেন। এ পূর্বাভাষ সম্পর্কে দর্শকগণ জ্ঞাত আছে, কিন্তু মাহাবিয়া এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত। ফলে 'মাহাবিয়া'- চরিত্র এবং দর্শকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আর এর ফলে নাট্যশ্লেষ পরিস্ফুট হয়েছে। এটিকে বাচনিক বা শব্দগত নাট্যশ্লেষ বলে শনাক্ত করা যায়।

এরপর একদা মাহাবিয়া মূত্রত্যাগ করতে গেলেন। সেখানে একটি সর্প তাকে দংশন করল। বিষের জ্বালায় মাহাবিয়া প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন। এমন সময় অনেক পাত্রমিত্র ও বৈদ্য এল। তারা তাঁর নাড়ি ধরে পরীক্ষা করল। তারপরে বৈদ্য বলল :

রতি রস কর রাজা রমনী সহিতে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৩)

মাহাবিয়া এর উত্তরে বললেন :

পুনি না করিমু আর নারীতে রমন ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৩)

উপর্যুক্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যশ্লেষ পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ 'পূর্বাভাষ'-সম্পর্কে পাত্রমিত্র ও বৈদ্যগণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছে ; কিন্তু মাহাবিয়া কিংবা দর্শকগণ এ সম্পর্কে পুরোপুরি অপরিজ্ঞাত। ফলে এখানে পাত্রমিত্র ও বৈদ্যগণ এবং দর্শকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সুতরাং এখানে নাট্যশ্লেষের সৃষ্টি হয়েছে। একে বাচনিক বা শব্দগত নাট্যশ্লেষ বলে চিহ্নিত করা যায়।

'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে আরও নাট্যশ্লেষ প্রত্যক্ষ করা যায়। মাহাবিয়া সর্পবিষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একজন জরাগ্রস্ত নারীকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন। তাঁর অনুচরগণের সাহায্যে এ বিবাহকার্য সম্পন্ন হল। তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে মাহাবিয়া রাত্রি যাপন করলেন। আর এর ফলে তিনি সর্পবিষ থেকে মুক্ত হলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীরূপে তিনি বার বৎসরের একজন সুন্দরী কন্যাকে দেখলেন। মাহাবিয়া বিস্মিত হলেন। কারণ বার বছরের কন্যাটিকে মাহাবিয়া পূর্বে দেখেন নি, কিন্তু দর্শকগণ দেখেছে। বস্তুত দর্শকের উপস্থিতিতে মাহাবিয়ার সঙ্গে কন্যাটির বিবাহ হয়েছে। ফলে 'বিবাহ'-সম্পর্কীয় ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মাহাবিয়া ও দর্শকদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে। আর এখানেই 'নাট্যশ্লেষ' সৃষ্ট হয়েছে। একে ঘটনাগত নাট্যশ্লেষ বলে শনাক্ত করা যায়। এরপর এ কাব্যে হাসনকে বধ করার জন্য এজিদ একজন কুটনী বুড়ীকে নিযুক্ত করল। এ বুড়ীটি ছলনার আশ্রয় নিয়ে হাসনকে খাওয়ানোর জন্য

হাসনস্ত্রীকে একটি বিষগুলী দিল। অতঃপর হাসনস্ত্রী ওই গুলীটি গ্লাসভর্তি পানিতে মিশিয়ে তৃষ্ণার্ত হাসনকে খেতে দিলেন। এখানে 'বিষগুলী'-সম্পর্কে দর্শক জ্ঞাত আছে, কিন্তু হাসনস্ত্রী জ্ঞাত নন। এ কারণে হাসনস্ত্রী ও দর্শকদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হল। আর এর ফলে নাট্যশ্লেষ ঘনীভূত হল। একে ঘটনাগত নাট্যশ্লেষ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

কবি হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে উপর্যুক্ত দৃশ্যগুলোর বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাবে দিয়েছেন :

ঘরেত গীয়া বুড়ি বিস্ব গুলি লৈল।
ডানি হৈআ হাছনের প্রানি খাইতে গেল ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৩)

এরপর বুড়ী হাসনগৃহে গেল এবং হাসনস্ত্রীকে বলল :

এই গুলি মলি জল কটরা ভরিআ।
সিঘ্রে হাছনের হাথে দিবাএ তুলিআ ॥
তুমার হাথ হনে পানি জখনে খাইবা।
প্রাণ পন করি মনে তুমাকে দেখিবা ॥
আর না বাঞ্চিবা [কিছু] তুমা পরিহরি।
এই বাক্য সত্য মর জান দঢ় করি ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৫৪)

'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে মাহাবিয়া তার পুত্র এজিদকে পূর্বাভাষ দিয়েছেন :

একখানি কথা মুই কহু তর ঠাঞি।
মদিনাতে হাছন হুছন দুই ভাই ॥
রছুলকে দেখি তানে মন্দ না করিবা।
কাছে আইলে গৌরবে সম্বাসাএ বৈসাইবাএ ॥
জেকালে জে ঠাঞি তানে দিবা এ সর্ব্বথা। (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৪-৪৫)

কিন্তু মাহাবিয়ার এই নির্দেশ ('যতনে পালিও বাপু মোরে এই কথা') এজিদ মান্য করে নি। যেজন্য এজিদ হাসন-হুসন বধের নির্দেশ দিয়েছিল। এরপরে হাসন-হুসনের সপরিজন (আলী আসগর ব্যতীত) নিহত হলেন। এখানে এজিদ-চরিত্রটি নাট্যশ্লেষের উদাহরণস্থল।

(২.৫) 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের 'নাটকীয়তা'-র সারোদ্ধার : নাট্য- আকস্মিকতা

নাটকীয়তার একটি বিশেষ লক্ষণ হল 'নাট্য-আকস্মিকতা'। 'অ্যাকশন' ও 'উৎকণ্ঠা' সৃষ্টির জন্য আকস্মিকতার প্রয়োজন হয়। এ কারণে নাটকে আকস্মিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। নাটকের পরিস্থিতির মধ্যে যখন কোনো নতুন উপাদান এসে এর পরিবর্তন সাধন করে, তখনি নাট্য-আকস্মিকতার উদ্ভব হয়।[৫০] স্মরণযোগ্য : অ্যারিস্টোটল 'Unexpectedness'-শব্দটির মধ্যদিয়ে নাট্য-আকস্মিকতার আভাস দিয়েছেন। মঞ্চের নেপথ্যে নানারকম শব্দ (Sound effect), কোনো চরিত্রের হঠাৎ করে উপস্থিতি এবং ওই চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান ইত্যাদি এর উদাহরণস্থল। বিশেষ করে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে প্রায়শই 'নাট্য-আকস্মিকতা' লক্ষিত

হয়। যেমন : খলব্যক্তি জোরপূর্বক নায়িকাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওই খল ব্যক্তিটির সঙ্গে ৫০/৬০ জন দুর্জন রয়েছে। এমন সময় হঠাৎ করে একজন নায়কের আবির্ভাব হল এবং নায়কটি ওই দুর্জনদের কবল থেকে নায়িকাকে রক্ষা করল। আর এর ফলে খলব্যক্তি ও তার সঙ্গীরা আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল ত্যাগ করল। এখানে 'নায়ক'-চরিত্রটি নাট্য-আকস্মিকতার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে যখন কোনো একটি মেয়ে সাদা পতাকা হাতে শান্তির বাণী নিয়ে আসে, তখন আকস্মিকতা সৃষ্ট হয়।[৫১] সাম্প্রতিককালে ইরাকযুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে আর্ন্তজাতিক রেডক্রসের গাড়ির আগমন লক্ষিত হয়। এ গাড়িটি এখানে আকস্মিকতার সৃষ্টি করেছে।

কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে অজস্র নাট্য-আকস্মিকতার লক্ষণ প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। এ কাব্যে 'মাহাবিয়ার পুনর্বিবাহ ও এজিদের জন্ম'- কাব্যাংশে নাট্য-আকস্মিকতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন :

মাহাবিয়া সয্যা হনে আইলা বাহিরে ॥
লঘি করি পুনরপি হইআ সাবোধান।
বিচারিআ না পাইল মাটি একখান ॥
অনেক জতন করি মাটি না পাইল।
দেওআলেত গিআ লঘি পুছিতে লাগিল ॥
গজমুখ এক সর্প আছিল তাহাতে।
কামড় মারিল সেই লিঙ্গের মুড়েতে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪২)

উপর্যুক্ত ছত্রটি বিশ্লেষণ করলে আমরা একটি সর্প দৃশ্যমান হতে দেখি। মাহাবিয়ার মূত্রত্যাগ করার সময় হঠাৎ করে ওই সর্পটির আর্বিভাব ঘটল। অতঃপর ওই সর্পটি মাহাবিয়ার পুংজননেন্দ্রিয়ে দংশন করল। সর্পটির আর্বিভাবের মধ্য দিয়ে এখানে নাট্য-আকস্মিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

পরবর্তিকালে মাহাবিয়ার জীবন রক্ষার্থে তাঁর বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ বিবাহের আয়োজনকালে মাহাবিয়া একজন জরাগ্রস্ত্ব নারীকে অন্বেষণ করতে বললেন। এরপরেই মাহাবিয়া অচেতন হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিবাহের আয়োজকগণ দ্বাদশ বৎসরের একজন সুন্দরী কন্যার সঙ্গে মাহাবিয়ার বিাহকার্য সম্পন্ন করালেন। অতঃপর রতিরসক্রিয়ার সাহায্যে মাহাবিয়ার জ্ঞান ফিরল। পরমা সুন্দরী স্ত্রী দেখে মাহাবিয়া বিস্মিত হলেন। পরমা সুন্দরী কন্যা এখানে নাট্য-আকস্মিকতার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। কবি হামিদ তাঁর 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে ওই দৃশ্যটির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

নিকা বান্ধি দিলা সবে প্রসন্ন বদন ॥
ততক্ষণে তান সনে করিলা রমন।
বিস নাস হৈল রাজা পাইলা চেতন ॥
রজনি পুহাইআ জবে অন্তর হইলা।

পরম সুন্দরি কৈন্যা তখনে দেখিলা ॥
দ্বাদস বৎসরের কৈন্যা দেখিতে সুঠান।
কামদেবের রতি কিবা আইলা বিদ্যমান ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৪৩)

এ কাব্যের 'হুসনের কারবালার আগমন'-শীর্ষক কাব্যাংশে নাট্য-আকস্মিকতার লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা যায় :

চলিলা হুছন মঞ্জিল জদি আর।
কতদূরে পাইলা ভুমি দস্থ কর্ব্বলার ॥
প্রথম দিবস মহরমের আছিল।
ঘটক কটক উট সেখানে রহিল ॥
ঘটক উস্থর আদি বহুল মারিলা।
একপদ তথা হনে আগে না করিলা ॥
নিসি আসি হৈল তবে তিমির সমএ।
সা[ক্র] মিত্র তাতে কিছু নাহি পরিচয় ॥
হাথে অস্ত্রে স্বন্য সব আছিলা সাবহিতে।
ঝিকিমিকি খড়্গের বিদ্বুত জেন তাতে ॥
নিসি সেস হৈলা দিনমনির উদয়।
উঠিআ দেখিলা ভূমি সব রক্তময় ॥
স্বন্যের মধ্যে বৃদ্ধ একজন আছিলেক।
হুছনে আপনে তার স্থানে পুছিলেক ॥
এই কুন দেস হএ কুন হএ গ্রাম।
নিশ্চয় কহিবাএ ভাই কিবা এর নাম ॥
কতক্ষন থাকি বৃদ্ধে লাগিল কহিতে।
দস্ত কর্ব্বলঅ নাম কহএ জগতে ॥
সুনিআ মুমিনপতি লাগিলা কহিতে।
ইস্বরের ইচ্ছা জে সর্ব্বথা হএ তাতে ॥ (সংগ্রামহুসন, পৃ. ৬৬-৬৭)

উপর্যুক্ত কাব্যাংশে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাট্য-আকস্মিকতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : হুসন কারবালায় এলেন। তিনি অধিকাংশ সৈন্যের হাতে অস্ত্র দেখতে পেলেন। সে-অস্ত্রগুলো বিদ্যুতের মত দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। কারণ রাতের আবছায়া আলোয় সব সৈন্যকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। অতঃপর সকল সৈনিককে তিনি মৃত অবস্থায় দেখলেন। তিনি আরও দেখলেন যে ভূমি রক্তময়। এমন সময় একজন বৃদ্ধ সৈনিক কথা বলে উঠল। হুসন তার কাছে গেলেন। সৈনিককে বলল : 'দস্ত কর্ব্বলঅ নাম কহএ জগতে'। এখানে 'বৃদ্ধ সৈনিকটির' মাধ্যমে নাট্য-আকস্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যে আমরা অজস্র যুদ্ধ ও মৃত্যুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। একাব্যের 'রহবার যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'জাফর ও কাসিমের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'অহবার যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হরএজিদের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হাসনপুত্র কাসিমের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'আলী আকবরের যুদ্ধ ও মৃত্যু', 'হুসনের সংগ্রাম-১', 'হুসনের জলসংগ্রহের-চেষ্টা : মৃত স্বজনদের কথা ভেবে উদ্যোগ পরিহার', 'হুসনের সংগ্রাম-২' 'অশ্বপৃষ্ঠ থেকে আহত হুসনের পতন :

মনহুলকর্তৃক শিরকর্তন' প্রভৃতি কাব্যাংশগুলোতে নাট্য-আকস্মিকতা পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে : নাটকে অ্যাকশন ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টির জন্য আকস্মিকতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে কোনো পরিস্থিতির যুদ্ধ ও মৃত্যুর দৃশ্যে অ্যাকশন ও নাট্যউৎকণ্ঠা সৃষ্ট হয়। তেমনি আলোচ্য যুদ্ধ ও মৃত্যুর দৃশ্যগুলোতেও সুস্পষ্টরূপে নাট্য-আকস্মিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে।

(৩.০) শেষ কথা

মধ্যযুগের কবি-হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের নাটকীয়তার লক্ষণগুলো যৌক্তিক উপায়েই নিরূপিত হয়েছে। এ কাব্যটিতে যেমন নাটকীয়তা প্রস্ফুটিত হয়েছে, তেমনি নাটকের অধিকাংশ উপাদান সংযুক্ত হয়েছে। (স্মরণযোগ্য : মধ্যযুগের অনেক বাংলাকাব্যে 'নাটকীয়তা' ও 'নাটকের উপাদান' বহুস্থলে পরিদৃষ্ট হয়।) তবে এগুলোর বিশ্লেষণ অবশ্যই নাট্যতত্ত্বের পাশ্চাত্য মতানুযায়ী সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া প্রাচীন কাব্যের আধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয় ও অযথার্থ নয়। তাই 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যের 'নাটকীয়তা'-র সারোদ্ধার করতে গিয়ে আমরা নাট্যতত্ত্বের পাশ্চাত্য মতকে প্রাধান্য দিয়েছি। উল্লেখ্য, নাট্যতত্ত্বের বিচারে 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যটিকে 'ট্রাজেডি'-শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায়। প্রসঙ্গত অ্যারিস্টোটলের ভাষ্য স্মর্তব্য :

> Tragedy, then is an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornaments; the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative ; through pity and fear effecting the proper katharsis pugation of these emotions.[৫২]

'ট্র্যাজেডির'-র অর্থ-অনুসারে আমরা 'সিরিয়াস অ্যাকশন' এবং মানব জীবনের গাম্ভীর্যপূর্ণ যন্ত্রণাদায়ক কথনকেই বুঝে থাকি। আর এই 'সিরিয়াস অ্যাকশন'-এর অর্থ-অনুসারে এরিস্টটল 'ভয়' ও 'করুণা'-কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মানব জীবনের কোন কোন ঘটনার মাধ্যমে 'ভয়' ও 'করুণা' উদ্রিক্ত হয়।[৫৩] দৃষ্টান্তস্বরূপ : কোনো একটি ঘটনা দুই শত্রুর মধ্যে ঘটল। এ ঘটনাটি খুবই ভয়ঙ্কর(=ভয়)। কিন্তু ঘটনাটি 'ভয়ঙ্কর' হলেও 'করুণ' হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ দৃশ্যটি করুণ হবে। ধরা যাক : একটি ফ্লাটে দুই বন্ধু বাস করে। একজন মেয়েকে কেন্দ্র করে এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে হত্যা করল। এ দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর(=ভয়)। আবার মৃতবন্ধুটির দেহ, মাথা, হাত ও পা ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে ; এ দৃশ্যটি ভয়ঙ্কর হলেও 'করুণা'-র উদ্রেক করে। অ্যারিস্টোটল এ প্রসঙ্গে বলেছেন : নাটকের নায়ক চরিত্রটি জীবন সংগ্রামে নানারকম ভুলভ্রান্তির বশে দৈবদুর্বিপাকে নিপীড়িত হতে পারে। কিন্তু তার চরিত্রটিকে সৎ, যথোপযোগী, জীবনসত্যের অনুগ ও সর্বপ্রকারে সুসমঞ্জস্য হতে হবে।[৫৪] স্মরণযোগ্য : অধিকাংশস্থলে

মানবপ্রবৃত্তি, মানবচরিত্র ও মানবভাগ্যের গভীর উৎসস্থলে ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত থাকে। তাই 'ট্র্যাজেডি'-কে বিশেষ রসের ও বিশেষ প্রকৃতির সাহিত্যসৃষ্টি[৫৫] বলে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উপরিউল্লিখিত আলোচনা ও দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে ট্রাজেডিকে শনাক্ত করা যায়। আলোচ্য কাব্যটিতে আমরা ট্রাজেডির সকল লক্ষণই ফুটে উঠতে দেখি। কারণ এ কাব্যটিতে অজস্র যুদ্ধ ও মৃত্যুর দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। এ কাব্যে হাসান-হুসন সপরিজন নিহত হয়েছেন। বিশেষত এখানে হাসন-হুসনের করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ট্রাজেডি-রস ঘনীভূত হয়েছে। এ কারণে এ কাব্যটিকে আমরা ট্রাজেডি হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। মধ্যযুগের বহু বাংলা কাব্যকে, অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেচনায়, 'বাংলাকাব্যনাটক'-রূপেও সনাক্ত করা যায়।[৫৬] কারণ, আমরা পূর্বেই বলেছি যে মধ্যযুগের বাংলাকাব্য 'নাটকীয়তা', 'নাটকের উপাদান' প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ কাব্যগুলোর ছত্রসমূহের মধ্যে চরিত্রগুলোর পরিচয়ও উপ্ত আছে। কেবল এ ছত্রসমূহ থেকে ওই চরিত্রগুলোকে পৃথক করে নিলেই সম্পূর্ণ কাব্যনাটকের পরিচয় লাভ করা যায়। তাই সম্প্রসারিত অর্থে, কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'-কাব্যটিকেও আমরা 'মধ্যযুগের বাংলাকাব্যনাটক'-রূপে অভিহিত করতে ইচ্ছুক।

তথ্যপঞ্জি :

১. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত *সংগ্রামহুসন*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৬
২. ঐ, শিরোনামহীন ভূমিকাংশ
৩. ঐ, পৃ. ১৩
৪. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত *সংগ্রামহুসন*, ঢাকা, ২০০২ গ্রন্থ থেকে এসব দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়েছে।
৫. ঐ, পৃ. ১৩
৬. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত *সংগ্রামহুসন*, ঢাকা, ২০০২ গ্রন্থ থেকে এসব দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়েছে।
৭. ঐ, পৃ. ২৫-২৬
৮. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৩
৯. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৮
১০. ঐ, পৃ. ১৫৮
১১. মুস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ, *অভিনয়ের পাঠ*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৪
১২. মুস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ, *ছোটদের অভিনয়*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ৩৮
১৩. ঐ, পৃ. ৩৮
১৪. রুশ নির্দেশক, অভিনেতা, তাত্ত্বিক ও শিক্ষক। বিশেষ করে, তিনি বিশ শতকের অন্যতম

তাত্ত্বিক বলে খ্যাতিমান। তিনি 'মনঃকৌশল'-শিরোনামের অভিনয় পদ্ধতির উদ্ভাবক। দ্রষ্টব্য : সোনিয়া মুর, *স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনয় পদ্ধতি*, অনুসৃজন : মুস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৪-৯৫

১৫. ঐ, পৃ. ২৪

১৬. ঐ, পৃ. ২৪

১৭. গ্রিক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। তাঁর '*Poetics*' (আনুমানিক ৩৩০ খ্রি. পূ.)- শিরোনামার গ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে নাটকের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে, এ গ্রন্থে ট্রাজেডি, কমেডি, মহাকাব্য প্রভৃতি বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : John Russell Taylor, *The Penguine Dictionary of the theatre*, England, 1970, p. 19

১৮. S.H. Butcher (Translated wiith Critical Notes), *Aristotle's Theory of poetry and Fine Art*, New Delhi, 1933, p. 240

১৯. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

২০. Ingram Bywater (Translated), *Aristotle On the Art of poetry*, Delhi, 1994, p. 37

২১. জার্মানির বিশিষ্ট দার্শনিক ও দ্বন্দ্ববাদের স্রষ্টা। তিনি অস্তিত্ববাদী ধারারও একজন সংগঠক। দ্রষ্টব্য : Richard R. Dixon and Murad Saifulin(ed.), *A dictionary of Philosophy*, Union Soviet Socialist Republics, 1967, p. 186

২২. Milton Marx, *The Enjoyment of Drama*, New York, 1940, p. 45

২৩. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

২৪. বিশিষ্ট নাট্যতাত্ত্বিক

২৫. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

২৬. ঐ, পৃ. ৭

২৭. বিশ শতকের রুশ নাট্যকার। তাঁর নাটকে মনোবিদ্যাগত বাস্তববাদ (Psychological Realism) এর নিদর্শন লক্ষ করা যায়। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে : *Three Sisters* (1901), *The Cherry Orchard* (1904) অন্যতম।

২৮. বিশিষ্ট মার্কিন নাট্যতত্ত্ববিদ

২৯. Raymaond Hull, *Profitable playwritting*, USA, 1968, p. 14

৩০. ঐ, পৃ. ১৪

৩১. Milton Marx, *The Enjoyment of Drama*, NewYork, 1940, p. 48

৩২. ঐ, পৃ. ৪৮

৩৩. ঐ, পৃ. ৪৮

৩৪. খ্যাতিমান ব্রিটিশ নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি কতিপয় নাটক রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'Hamlet, King Lear, Macbeth, অন্যতম। দ্রষ্টব্য : John Russell Taylor, The *penguin Dictionary of the Theatre*, England, 1970, p. 254-255

৩৫. Raymond Hull, *Profitable Playwriting*, USA, 1968, p. 15

৩৬. নরওয়ের কবি ও নাট্যকার। থিয়েটারের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কতিপয় নাটক

রচনা করেছেন। নাটকগুলোর মধ্যে 'An Enemy of the people' অন্যতম। দ্রষ্টব্য : Martin Banham (ed.), *The Cambridge Guide to theatre*, New York, 1990, p. 467

৩৭. Milton Marx, *The Enjoyment of Drama*, New York, 1940, p. 49

৩৮. Raymond Hull, *Profitable Playwriting*,USA, 1968, pp. 15-16

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

৪০. হেনরিক ইবসেন-এর রচনা। ইতঃপূর্বে 'ইবসেন' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে

৪১. Raymond Hull, *Profitable Playwriting*, USA, 1968, p. 16

৪২. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ববিচার*, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ১৩

৪৩. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট নাট্যতাত্ত্বিক

৪৪. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৪৫. সোফোক্লেস (৪৯৬-৪০৬ খ্রি. পূ.) গ্রিসের একজন খ্যাতিমান নাট্যকার ছিলেন। তিনি প্রায় একশটি নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে মাত্র সাতটি ট্রাজেডি এবং একটি প্রহসন (= নাটক) পাওয়া যায়। এ নাটকগুলোর মধ্যে *'Oedipus Rex'* (অনুমানিক ৪২৫ খ্রি. পূ.) এবং *'Antigone'* (অনুমানিক ৪৪২ খ্রি. পূ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রষ্টব্য : John Russel Taylor, *The Penguine Dictionary of the Theatre*, England, 1970, p. 261

৪৬. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), মধ্যযুগের কবি হামিদ প্রণীত *সংগ্রামহুসন*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৮

৪৭. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

৪৮. ঐ, পৃ. ১৬

৪৯. ঐ, পৃ. ১৬

৫০. ঐ, পৃ. ১৫

৫১. অজিতকুমার ঘোষ, *নাটকের কথা*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৭

৫২. S. H. Butcher (Translated with an Critical Notes), *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, New Delhi, 1993, p. 240

৫৩. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৯৫

৫৪. শীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য সন্দর্শন*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৫

৫৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৭৯-১৮০

৫৬. শ্রীরায়বিনোদপ্রণীত *পদ্মাপুরাণ-কাব্য : নাটকের উপাদানপ্রসঙ্গ* (পাশ্চাত্য মত-অনুযায়ী)-শীর্ষক অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।